নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম ও নাগরিক ভাবনা

মো. আবদুল লতিফ মন্ডল, ৩১ ডিসেম্বর ২০১২

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ভূমিকা অপরিসীম। সাধারণ নির্বাচন যদি সুষ্ঠু, অবাধ এবং নিরপেক্ষ হয়, তাহলে জনগণ ভয়ভীতি ছাড়া এবং প্রভাবমুক্ত থেকে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। নির্বাচন কমিশন যদি রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের প্রভাব মুক্ত থেকে এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে রেখে সাধারণ নির্বাচন পরিচালনা করতে পারে, তবে এর ফলে গঠিত সংসদে জনগণের ইচ্ছের প্রতিফলন ঘটে। তা না হলে যে সংসদ গঠিত হয় তাতে জনগণের ইচ্ছের প্রতিফলন হয় না। সুতরাং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনই পারে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও এর বিকাশ নিশ্চিত করতে ।

সংবিধান রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদের নির্বাচনসহ প্রাসঙ্গিক আরো কিছু দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত করেছে। সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধায়ন, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত থাকবে এবং নির্বাচন কমিশন সংবিধান ও আইনানুযায়ী (ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে; (খ) সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে; (গ) সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করবে; এবং (ঘ) রাষ্ট্রপতি পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুত করবে।

এ অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে, উপর্যুক্ত দায়িত্বগুলোর অতিরিক্ত যেরূপ দায়িত্ব সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে, নির্বাচন কমিশন সেরূপ দায়িত্ব পালন করবে। সে অনুযায়ী প্রণীত আইনে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশন ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

এসব দায়িত্ব পালনে, বিশেষ করে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে, নির্বাচন কমিশন যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কি-না। কারণ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন স্বাধীন ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন। এখন নজর দেয়া যাক নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতার দিকে। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সাংবিধানিক দায়িত্ব (অনুচ্ছেদ ১২৬)। অর্থাৎ নির্বাচন কমিশন তার দায়িত্বপালনে যে কোন নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তা চাইতে পারে এবং ওই কর্তৃপক্ষ নির্বাচন কমিশনকে প্রার্থিত সহায়তা প্রদানে বাধ্য থাকবে।

নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য সুষ্ঠু ভোটার তালিকা অপরিহার্য। ভোটার তালিকা আইনে ভোটার তালিকা প্রণয়নে নির্বাচন কমিশনকে অবাধ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে কমিশনের কার্যক্রমের বৈধতা বা যথার্থতা নিয়ে কোন আদালত প্রশ্ন করতে পারবেন না। The Delimitation of Constituencies Ordinance, ১৯৭৬-এ বিধান করা হয়েছে যে, সংসদ নির্বাচনে নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণে কমিশনের কোন কার্যক্রমের বৈধতা নিয়ে কোন আদালতে বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯-এ নির্বাচন কমিশনকে আর্থিক স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। সরকার প্রতি অর্থবছরে নির্বাচন কমিশনের ব্যয়ের জন্য, নির্বাচন কমিশন হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব বিবেচনাক্রমে, এর অনুকূলে বাজেটে নির্ধারিত বরাদ্দ করবে; এবং অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে উক্ত অর্থ হতে ব্যয় করার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা নির্বাচন কমিশনের জন্য আবশ্যক হবে না। এ আইনে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ওপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়নি। বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা দফতরের প্রশাসনিক আওতাধীন থাকবে না। এর সার্বিক নিয়ন্ত্রণ প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) ওপর ন্যস্ত থাকবে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) এবং কার্য বিধিমালা মোতাবেক ভোট গ্রহণের জন্য ব্যক্তিবর্গ যেমনঃ রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারবৃন্দ নিয়োগের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এ আদেশে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য কোন রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধিত করা বা কোন দলের নিবন্ধন বাতিল করার ক্ষমতা কমিশনের ওপর ন্যস্ত। সংবিধানে বিধান করা হয়েছে যে, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে এরূপ কোন নির্বাচনের বিষয়ে কোন আদালত নির্বাচন কমিশনকে যুক্তিসংগত নোটিশ ও শুনানীর সুযোগ না দিয়ে অন্তর্বর্তী বা অন্য কোন রূপে কোন আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করবে না। এরকম আরো উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। অবশ্য এদ্বারা এটা বুঝায় না যে, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে আরো শক্তিশালী করার প্রয়োজন নেই।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কেবলমাত্র নির্বাচন কমিশনকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে কি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা যাবে? উত্তর হলো, সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন নির্বাচন কমিশনের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা। নির্বাচন কমিশনকে বিশ্বাস অর্জন করতে হবে নির্বাচনে প্রধান স্টেক হোল্ডার রাজনৈতিক দলগুলোর; সহযোগিতা পেতে হবে সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের । সংবিধানে সিইসি ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে আইন প্রণয়নের নির্দেশনা থাকলেও গত চার দশকে তা করা হয় নি। ফলে তাদের নিয়োগ সময়ে সময়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকারের খেয়াল-খুশির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। অভিযোগ উঠেছে নির্বাচন কমিশন দলীয়করণের, নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে।

দলীয়করণের অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম নিয়ে গত চার দশক ধরে বিরোধী দল ও সুশীল সমাজ প্রশ্ন তুলে আসছে। স্বাধীনতার পরবর্তী প্রায় দশকে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোতে নির্বাচন কমিশনের চেয়ে সরকারই এসব নির্বাচন সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। নির্বাচনের ফলাফল আগে থেকেই ছকে বাধা থাকায় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার তা কোনরূপ ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি। জনগণ নির্বাচনের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। ১৯৯১ সালে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর গত দুদশকে গঠিত নির্বাচন কমিশনগুলোও দলীয়করণের অভিযোগ হতে রেহাই পায়নি। পরাজিত বিরোধী দল এ সময়কালে অনুষ্ঠিত সব জাতীয় নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যান করেছে। বর্তমান নির্বাচন কমিশনের নিয়োগ নিয়েও দলীয়করণের অভিযোগ উঠেছে। ইতোমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে।

আগামী সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ নিয়ে নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম, বেসরকারি সংস্থা ও নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা শেষ করেছেন। নিবন্ধিত দলগুলোর মধ্যে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি এবং বিএনপি জোটভুক্ত কয়েকটি দল আলোচনায় যোগ দেয়নি। নির্বাচন কমিশন বলেছে, The Delimitation of Constituencies Ordinance, ১৯৭৬ এর ৮ ধারা মোতাবেক আগামী দশম সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সুশীল

সমাজের বেশির ভাগ প্রতিনিধি ২০০৮ সালে সীমানা নির্ধারণকালে জনসংখ্যার বিভাজনকে প্রাধান্য দিয়ে মফস্বল এলাকার আসন সংখ্যা কমিয়ে ঢাকা শহরের আসন সংখ্যা ৮ হতে ১৫ তে উন্নীত করাকে অযৌক্তিক আখ্যায়িত করে ঢাকা শহরের আসন সংখ্যা পুনরায় ৮টি করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তবে কেউ কেউ ২০০৮ সালে নির্ধারিত নির্বাচনী সীমানা বহাল রাখার পক্ষে মত দেন। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ২০০৮ সালের পূর্বের অবস্থাকে ভিত্তি ধরে সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের পক্ষে মত প্রকাশ করে। তবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালে নির্ধারিত নির্বাচনী সীমানায় আগামী দশম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে মত প্রকাশ করে। অনুরূপ মত প্রকাশ করেছে গণফোরাম। 'সীমানা নির্ধারণে আমরা কিছুতেই আইনের বাইরে যাব না'-- সিইসির এরূপ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সংলাপ অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। একটি বাংলা দৈনিকে বলা হয়, আইনের মধ্য থেকে সীমানা নির্ধারণ করলে এত টাকা খরচ করে সংলাপ কেন, এতে প্রাপ্তি কী (দৈনিক যুগান্তর, ২ ডিসেম্বর, ২০১২)।

সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম ও নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের সংলাপ শুধু কী সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। গত আগষ্টের প্রথম সপ্তাহে ঘোষিত নির্বাচনী রোডম্যাপে কমিশন বলেছিল, আরপিও সংশোধনের খসড়া তৈরি করে অক্টোবরের মধ্যে কমিশন রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংলাপে বসবে। নির্বাচন কমিশনের সূত্রের বরাত দিয়ে পত্র-পত্রিকার সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশন নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে আরপিওর সংশোধনীচূড়ান্ত করে সরকারের নিকট প্রেরণ করবে। সংবাদপত্র ও অন্যান্য সূত্রে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, বর্তমান কমিশন আরপিওতে যেসব সংশোধনী আনতে চায় সে সব সংশোধনী প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে। এতে অন্যান্যের মধ্যে রয়েছে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় সব মন্ত্রণালয়ের ওপর কমিশনের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, নির্বাচনী ব্যয়সীমা ও প্রার্থীর জামানত বৃদ্ধি, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য স্বতন্ত্র প্রার্থীর তার নির্বাচনী এলাকার কমপক্ষে এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন লাভ বিধানের বিলুপ্তি, ঋণ খেলাপির সংজ্ঞা সংশোধন, নির্বাচনী অপরাধের শাস্তি সুনির্দিষ্টকরণ।

সরকারের সব মন্ত্রণালয়ের ওপর নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণ চাওয়ার বিষয়টি অভিজ্ঞজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তারা মনে করেন, নির্বাচনের সময় সরকারের সব মন্ত্রণালয়ের ওপর কমিশনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অর্থ বাস্তবে সরকার পরিচালনার ক্ষমতা লাভ। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন ও অনুন্নয়নমূলক কার্যাবলী মূলত সরকারি কার্যক্রম। কর্মচারি ব্যবস্থাপনা ছাড়া এসব মন্ত্রণালয় ও তাদের অধীন অধিদফতর, স্বশাসিত সংস্থাগুলোতে বাস্তবায়িত হচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প। এগুলোর দায়িত্ব নেয়া কমিশনের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। বরং কমিশনের উচিৎ হবে সরকারের যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারি নির্বাচনের সঙ্গে সরাসরি জড়িত থাকেন, নির্বাচনের সময় তাদের ব্যবস্থাপনা কমিশনের নিয়ন্ত্রণে আনা। অর্থাৎ নির্বাচনের সময় তাদের পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদিতে কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। বাস্তবে এ ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ সব সাধারণ নির্বাচনের আগে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া আরপিও সংশোধনীর মাধ্যমে সব মন্ত্রণালয়ের ওপর কমিশনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে কি-না তাও দেখতে হবে।

এটা ঠিক যে, গত ফেব্রুয়ারিতে মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া ড. হুদার নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন আরপিওতে সংশোধনী আনার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উদ্দেশ্যে কমিশন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং সিনিয়র সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসে তাদের মতামত নেয়। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিএনপি কমিশনের সঙ্গে আলোচনায় বসেনি। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ আলোচনায় বসলেও কমিশনের তৈরি খসড়ার ওপর কোনো মতামত প্রদানে বিরত থাকে। মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ওই নির্বাচন কমিশন আরপিওতে সংশোধনী আনার জন্য সরকারের নিকট একটি প্রস্তাব প্রেরণ করে। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা যায়, প্রস্তাবটিকে অসম্পূর্ণ আখ্যায়িত করে সরকার সেটি কমিশনে ফেরত পাঠায়। অন্যান্যের মধ্যে নিম্নোক্ত কারণে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের উচিৎ হবে আরপিও সংশোধনের জন্য নিবন্ধিত দল, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসা।

এক. সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আরপিও হচ্ছে মূল আইন। সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে কমিশনের ক্ষমতার, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য রাজনৈতিক দলের কমিশনে নিবন্ধিত হওয়া, রিটার্নিং অফিসার ও সহকারি রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রার্থীর যোগ্যতা, প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিল ও বাছাই, বৈধ প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়সীমা নির্ধারণ, রাজনৈতিক দলের অনুদান গ্রহণ, নির্বাচনী অপরাধের জন্য শাস্তি, নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষণাসহ বিভিন্ন বিষয় এ আইনে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক আরপিও সংশোধনে বর্তমান কমিশন হুদা কমিশনের অনেক প্রস্তাব বাদ দেয়ার এবং কিছু নতুন কিছু প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুতরাং কমিশনের উচিৎ হবেনা রাজনৈতিক দলসহ সুশীল সমাজ ও গণপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা না করে আরপিও সংশোধন প্রস্তাব চুড়ান্ত করা।

দুই. হুদা কমিশনের সঙ্গে আলোচনায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ যোগ দিলেও তারা আরপিও সংশোধনসহ অন্যান্য বিষয়ে কমিশনের প্রস্তাবে কোনো মতামত প্রদান করেনি। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলোতে তাদের সমর্থন না নিয়ে সরকারের নিকট পাঠানো হলে সেগুলো হুদা কমিশনের প্রস্তাবের ভাগ্য বরণ করতে পারে। আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে আরপিও সংশোধনের প্রস্তাব সরকারের নিকট পাঠানো হলে তা মন্ত্রিসভায় অনুমোদন এবং সংসদে পাস করানোর দায়বদ্ধতা অনেকটা তাদের ওপর বর্তাবে।

তিন. বিএনপি বলেছে, সংসদ নির্বাচনের সময় নির্দলীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনে সরকারি সিধান্ত হলেই বিএনপি নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে নির্বাচন মিশনের সঙ্গে সংলাপে বসতে রাজি, অন্যথায় নয়। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্বহালের শর্ত নির্বাচনী আইন সংস্কার ইত্যাদি নিয়ে কমিশনের সঙ্গে সংলাপে বসার শর্ত হিসেবে জুড়ে দেওয়া সমীচীন হবে কি-না তা বিএনপির পুনর্বিবেচনা করা দরকার। নির্বাচনী আইন সংস্কার সংক্রান্ত অলোচনায় সব নিবন্ধিত সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারা হবে নির্বাচন কমিশনের একটি সাফল্য। সিইসি বলেছেন, প্রধান বিরোধী দল বিএনপিসহ কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কমিশনের দুরত্ব নেই এবং তারা তাদের সবার বিশ্বাস অর্জনে সক্ষম হবে। নাগরিক সমাজও চায় কমিশন সফল হোক।

সবশেষে যা বলা দরকার তা হলো, নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমকে সবার নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো তাদের কথাবার্তা ও কাজে-কর্মে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার পরিচয় দেয়া। আগামী সংসদ নির্বাচনে সব নিবন্ধিত দলকে নির্বাচনে নিয়ে আসাই হবে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় সাফল্য।